মুক্তকথা

প্রতিরক্ষার কর্তব্য শুধু সেনাবাহিনীর নয়, প্রতিটি নাগরিকের

ফরহাদ মজহার

দুই হাজার আট সালে নভেম্বরের শেষের দিকে আমি দৈনিক নয়া দিগন্ত (২৫.১১.২০০৮) পত্রিকায় একটা লেখা লিখেছিলাম, যার শিরোনাম ছিল "সেনাবাহিনী থেকে ইসলামি ভূত তাড়ানোর 'সেকুলার প্লান"। হার্ভার্ড ইন্টারন্যাশনাল রিভিউ নামক পত্রিকায় ১৯ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে সজীব ওয়াজেদ জয় ও ইরাক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মার্কিন সামরিক অফিসার কার্ল সিওভাক্কো যৌথ যে নিবন্ধ লিখেছিলেন সেটা পড়ে বাংলাদেশে কী ঘটতে পারে তার একটা আন্দাজ করতে চেয়েছিলাম। সজীব ওয়াজেদ জয় একজন ব্যক্তিমাত্র নন। তিনি শেখ হাসিনার সন্তান, ফলে মায়ের চিন্তাচেতনা ও ধ্যানধারণার ওপর তার একটা প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু রক্তের সম্পর্ককে আমি গুরুত্ব দিয়ে দেখি নি। বরং গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি তার আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ হাসিনার উপদেষ্টা পদে থাকা। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এলে কী করবেন তার একটা আগাম পাঠ ওই লেখার মধ্যে ছিল বলে আমার মনে হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের বদৌলতে কোনো একটি দল ক্ষমতায় আসা মানে মূলত একজনের রাজত্ব বা একনায়কতান্ত্রিক শাসন বলবৎ করা। যে কারণে দলীয় প্রধান হিশাবে যিনি ক্ষমতায় আসেন তিনি নিজেকে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অধিপতি বলেই মনে করেন। যিনি মনে করেন দোষ তো তার নয়। যদি সংবিধানেই আমরা সে ব্যবসা রেখে দিই তাহলে অপরাধ তো আমাদেরই। বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধান্ত বিশেষত ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে ক্ষমতার চরিত্র একনায়কতান্ত্রিক হতে বাধ্য। কয়লা ধুলে যেমন ময়লা যায় না, তেমনি নির্বাচন করলেই এ ধরনের সংবিধানের একনায়কী আবর্জনা সাফ হয় না। এই একনায়কী শাসনকে সাংবিধানিক ভাবে বোঝার জন্য একে 'সাংবিধানিক একনায়কতন্ত্র' বলা যায়। আমার লেখালিখিতে সব সময় তাই বলে এসেছি এবং বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক ভাবে গড়বার জন্য নতুন একটি 'গঠনতন্ত্র' (ঈড়হংঃরঃঃড়হ) কেন দরকার বিভিন্ন সময় তার যুক্তি হাজির করেছি।

তাহলে সাংবিধানিকভাবে সিদ্ধ একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতাচর্চার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা হিশাবে মার্কিন সামরিক অফিসার কার্ল সিওভাক্কোর সঙ্গে সজীব ওয়াজেদ জয় যে পরিকল্পনা হাজির করছেন তাকে বাস্তবায়ন করা মোটেও কঠিন কিছু নয় বলেই আমার মনে হয়েছিল। একনায়কী শাসনের এই এক সুবিধা। লিখেছিলাম জয়-সিওভাক্কোর নিবন্ধটি পড়ে 'আমরা উপকৃত হয়েছি। কারণ বাংলাদেশে কী ঘটতে যাচ্ছে বা ঘটবে তার একটা আগাম সংকেত পেয়েছি আমরা'। সেই সংকেতটা কী সেটাই আমি আমার লেখায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এখানে সেই লেখার পুনরাবৃত্তি করব না। আমার অনুমান ঠিক ছিল কি না সেটা পাঠক এখন আবার পড়ে এখনকার ঘটনা নিজেই বিচার করে দেখতে পারেন।

বলাবাহুল্য সেই আগাম সংকেত পাবার পরেও বাংলাদেশ নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছে কি না, কতটুকু পেরেছে বা না পারলেও তার আশু কর্তব্যগুলো কী হতে পারে সে বিষয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে ভাবা দরকার। সেনাবাহিনীর 'বিশৃংখলা' বা 'অভ্যুত্থান'কে সেনাবাহিনীর মুখপাত্র ও আওয়ামী লীগ যেভাবে সেনাবাহিনীর কতিপয় ধর্মান্ধ কর্মকর্তা কর্তৃক অন্যদের দুরভিসন্ধিমূলক ধর্মান্ধতাকে পুঁজি করে... বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ধারাকে ব্যাহত করা অর্থাৎ শেখ হাসিনার 'ধর্মনিরপেক্ষ' সরকারকে উৎখাতের চেষ্টা চালিয়েছে বলে ছকে বাঁধা প্রচার করেছে সেই প্রপাগান্ডা কাজ করে নি। সেনাবাহিনীতে কোন 'বিশৃংখলা' বা অভ্যুত্থানের চেষ্টা কোন 'ধর্মান্ধ কর্মকর্তা' করল নাকি কোন 'ধর্মনিরপেক্ষ' কর্মকর্তা করল- প্রতিষ্ঠান হিশাবে তাতে কিছু আস্তেযায় না। সেনাবাহিনীর দিক থেকে শৃংখলা ভঙ্গ করল্লেই সেটা ধর্মের নামে হোক, কিংবা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে হোক- কিম্বা হোক জাতিকে দুই নেত্রীর কবল থেকে বা দুর্নীতির হাত থেকে মুক্ত করবার কথা বলে ক্ষমতা দখল করবার চেষ্টা- যে ছুতাতেই হোক সেটা সেনা আইনে অপরাধ। সেনাবাহিনী তাদের বিচার করতে বাধ্য।

দেশের ভেতরে এই ছকে বাঁধা প্রচারের ফল কী হয়েছে তা এখনো স্পষ্ট নয়। আমার অনুমান সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এই প্রচার বিশ্বাস করে নি। তবে আসলে কী ঘটেছে জানার আগ্রহীর সংখ্যা কম নয়। এটাও বোঝা যায় চট্টগ্রামে বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার কিছু বক্তব্যের সূত্র ধরে তাকে অভিযুক্ত করবার আওয়ামী কৌশলও কাজ করে নি। কিন্তু বিএনপির আঠারোই ডিসেম্বরের কর্মসূচিতে যে সহিংসতা ঘটেছে এবং বিএনপির বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ উঠেছে, তার দাগ বিএনপি কাটিয়ে উঠতে পেরেছে বলে মনে হয় না। এই অনুমান অনেকের মধ্যেই দানা বেঁধেছে যে দ্রুত ক্ষমতায় যাবার আশায় এই দলের মধ্যে কিছু হঠকারী শক্তির সমাবেশ ঘটেছে। এরা হয়তো বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বাদ দিয়েই কিছু একটা করে ফেলতে চায়। বাংলাদেশের ইতিহাস ও রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে যুদ্ধাপরাধের বিচার পন্ড করবার জন্য জামায়াতে ইসলামী নৈরাজ্যের রাজনীতি উসকে দিতে পারে- অনেকের মধ্যে বদ্ধমূল আশংকা রয়েছে। তাদের মধ্যে এই ছকে বাঁধা প্রচারকাজ করেছে। তবে এই প্রচারের পক্ষে সবচেয়ে বড ইন্ধন জুগিয়েছে হিযবুত তাহরীরের পোস্টার ও প্রচারপত্র। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধের অংশীদার বাংলাদেশের সুশীলসমাজ এই সকল পোস্টার ও প্রচারপত্র আশ্রয় করে বাংলাদেশে ইসলাম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতার বিভাজন্তরেখাকে আরো মোটা ও দৃশ্যমান করে রাখবার আরেকটি ভালো সুযোগ পাবে। তারা তাদের সমস্ত প্রতিভা দিয়ে তার সদ্ব্যবহার করবে। তাদের পত্রিকায় সেই অবিরত চেষ্টা আবার শুরু হয়ে গিয়েছে। এই প্রচারে হিযবুত তাহরীরের নগদ লাভ হচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষিত তরুণদের একটা বড অংশ তাদের কীর্তিতে অনুপ্রাণিত বোধ করবে। দলের শক্তি এতে বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা আছে। সেনাবাহিনীর মধ্যে সদস্য সংগ্রহের সাফল্য ও অভ্যুত্থান ঘটানোর প্রয়াসের যে কীর্তিকথা সেনাসদরের তরফে প্রচার করা হয়েছে, তাতে সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে এই দলের পরিচিতি বাডবে। এর মধ্য থেকে সেই পুরানা শিক্ষাটা আমাদের নতুন ভাবে পাঠ করতে হবে যে যারা মৌলবাদ ও ইসলামি সন্ত্রাসের কথা বলে তারা সেটা নানান কায়দায় তৈয়ারও করে। কেউ সজ্ঞানে, কেউ না জেনে। কিন্তু করে।

কিন্তু আন্তর্জাতিক ভাবে এই প্রপাগান্ডা গ্রহণযোগ্যতা পায় নি সেটা পরিষ্কার। হতে পারে বিপুল ভোটে ক্ষমতায় আসার পরেও কুশাসন, অর্থনৈতিক নৈরাজ্য, দুর্নীতি, ক্রমাগত মানবাধিকার লংঘন, মানুষ গুম করে ফেলা ইত্যাদি কারণে মহাজোট সরকারের অযোগ্যতা এতই প্রতিষ্ঠিত যে, এই প্রচারকে সেই আযোগ্যতা ঢাকা দেওয়ার নিষ্ফল চেষ্টা হিশাবেই দেখা হয়েছে। সীমান্তে হত্যা ও কিশোরী ফালানীর মতো নিস্পাপ মেয়েদের কাঁটাতারে ঝুলিয়ে রাখা এবং বিএসএফের মানুষ উলঙ্গ করে নির্মম ভাবে পেটানোর পরেও দিল্লির প্রতি শেখ হাসিনার সরকারের মনোভাব এটাই প্রমাণ করেছে যে, ভূ-রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের যদি স্বাধীন আঞ্চলিক ভূমিকার কোন সম্ভাবনা থেকেও থাকে এখনকার ক্ষমতাসীনদের দিয়ে তার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এই সরকারের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন এই কারণেও কমছে। তা ছাডা সেনাতরফে যে লিখিত বক্তব্য হাজির করা হয়েছে, তার দলীয় চরিত্র এতই স্পষ্ট যে অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্যতা সেনাবাহিনীর সংবাদ সম্মেলন ও লিখিত বক্তব্যের গুণেই কর্পূরের মতো হাওয়ায় উবে গিয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দলীয় স্বার্থে ব্যবহৃত হতে এখন অনেক বেশি উন্মুখ। সৈনিকতার মর্যাদা এবং প্রতিষ্ঠানের পেশাদার চরিত্র বহাল রাখবার অক্ষমতাও প্রকট হয়ে উঠেছে। নিজেদের মর্যাদা তারা নিজেরাই মারাত্মক ভাবে ক্ষুণ্ন করেছে।

বিএনপি, জামায়াত, হিযবুত তাহরীর ও 'সেনাবাহিনীতে কমব্রত কতিপয় ধর্মান্ধ কর্মকর্তা' বাংলাদেশে সেনা অভ্যুত্থান ঘটাবার চেষ্টা করেছে, এই চেষ্টা যে আন্তর্জাতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য হয় নি দিল্লি সেটা অনায়াসেই টের পেয়েছে। এই প্রথম দিল্লির পক্ষে প্রচার খুব একটা কাজে আসে নি। এরপর দিল্লির স্বার্থ বজায় রাখতে হলে প্রচারের ধরন কী হতে পারে সেটা খুঁজতে গিয়ে গালফ নিউজে কুলদীপ নায়ারের লেখাটি পড়ছি। কুলদীপ লেখাটি লিখেছেন জানুয়ারির ২৮ তারিখে, সেনাসদরের তরফে ১৯ তারিখে সংবাদ সম্মেলন করবার ৯ দিন পর। তত দিনে সংবাদ সম্মেলনের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা হয়ে যাবার কথা। দেখলাম কুলদীপ শুরুই করেছেন ভারতীয় গোয়েন্দাদের কীর্তির সাফাই গেয়ে। লিখছেন, 'অভ্যুত্থান বা ষডয়েন্ত্রর চেষ্টা ঘটে যাবার ওপর ধূলাবালি থিতু হয়ে যখন বসল তখন নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে যে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সেনাবাহিনীর ওপরওয়ালাদের কাছে শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে ষডযন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। এই বার বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সময়মতো কাজ করে আর বিদ্রোহ অংকুরেই পিষে ফেলে।' তাঁর দাবি, এর আগেও ১৯৭৫ সালে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সেনাবাহিনীকে সম্ভাব্য সেনা অভ্যুত্থান সম্পর্কে জানিয়েছিল, কিন্তু তখন য়েহতু সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাই অভ্যুত্থানের হোতা ছিলেন, অতএব সেই সতর্কতায় কাজ হয় নি। শেখ মুজিবুর রহমান তার পরিবারবগ্রের অনেক সদস্য সঙ্গে নিয়ে নিহত হয়েছেন।

কুলদীপ বলছেন, সেনাবাহিনী যে ক্ষমতা নিতে চায় না তার প্রমাণ হোল কিছু দিন আগে তারা নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ফিরে এলে তার হাত ধরে আবারও দুর্নীতি ফিরে আসবে এটা জানা সত্ত্বেও সেনাবাহিনী রাজনীতি ফিরিয়ে এনেছে। বিএনপি বা চারদলীয় জোট যদি ক্ষমতায় আসত তাহলে এই কথা কুলদীপ বলতেন কি না সন্দেহ। এবারের বিশৃংখলা বা অভ্যুত্থানের মতো কুকাজ যে সেনাবাহিনীর মধ্যে ধর্মান্ধ লোকজনই করেছে, সেই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন কুলদীপ। এই ধরনের লোকজন পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে যেমন আছে, বাংলাদেশেও ঢুকে পডছে। সেনাসদরের তরফে সংবাদ সম্মেলনে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে কুলদীপ নায়ারের বক্তব্যের বিশেষ অমিল নাই। কিন্তু কুলদীপ নতুন একটি তথ্য যোগ করেছেন সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ।

তিনি বলছেন, "আমার কাছে এমন তথ্য আছে যে,এবার অভ্যুত্থানের নেতারা এমন কিছু শক্তির কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে যারা ভারত থেকে তৎপরতা চালায়। ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসমের (উলফা) একটি অংশ অবশিষ্ট রয়ে গেছে। কথাটা খাটে বৈরী নাগাদের বেলায়ও। মনিপুরের বিদ্রোহীরাও এই ষডয়েন্ত্র জডতি। এটা বিস্ময়কর যে, বাংলাদেশ এখন তার ভূখন্ড থেকে কোনো ভারতবিরোধী শক্তিকে তৎপরতা চালাতে না দিলেও ভারত এ ক্ষেত্রে ঢিলেমি ও নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় দিচ্ছে।"

এই 'তথ্য'টা নতুন। সেনাসদরের তরফে যে লিখিত বক্তব্য দেওয়া হয়েছে, সেখানে এই ধরনের কোন অভিযোগ নাই। বাংলাদেশের ভূখন্ড থেকে নয়, বাংলাদেশের সেনা অভ্যুত্থানের নেতাদের সাহায্য করেছে ভারত থেকে উলফার একটি অংশ, বৈরী নাগা ও বিদ্রোহী মনিপুরিরা। কুলদীপ নায়ার তার কাছে এই তথ্য আছে বলে দাবি করেছেন, অতএব এই বিষয়ে আমাদের কিছু বলার নাই। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে, তদন্তের স্বার্থে তিনি এই তথ্য গোপনও রাখতে পারতেন। কিন্তু তা করেন নি। প্রশ্ন হচ্ছে, ফলাও করে এই তথ্য প্রচার করছেন কেন?

যেটা বুঝতে পারি, কুলদীপ নায়ার প্রমাণ করতে চান বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে যা কিছু ঘটছে সেটা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার মাত্র নয়, সেটা ভারতের নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। এই সম্পৃক্ততা প্রমাণ করা গেলে শেখ হাসিনাকে 'সব রকমের সাহায্য' দেবার পক্ষে ভারত অনায়াসেই আন্তর্জাতিক যুক্তি ও বৈধতা খাডা করতে পারে। ভারতের এই সবরকম সাহায্যের মধ্যে বাংলাদেশে গোয়েন্দা ও সামরিক হস্তক্ষেপও অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরের কোন তৎপরতা যদি ভারতের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়, তাহলে বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার আছে ভারতের। ভারতের বিরুদ্ধে প্রধান একটি অভিযোগ হচ্ছে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে ভারতীয় গোয়েন্দাদের তৎপরতা। বাংলাদেশের সেনা অফিসারদের ভারতীয় গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে- এই অভিযোগ খুবই স্পর্শকাতর। এই অভিযোগের বিপরীতে ভারতের পক্ষে কুলদীপ একটা যুক্তি খাডা করতে চাইছেন। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সঙ্গে তিনি বিদ্রোহী, উলফা, নাগা ও মনিপুরিদের যোগসাজশ আছে বলে প্রতিষ্ঠা করতে চান। যদি তা-ই হয় তাহলে ভারত তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার স্বার্থে বাংলাদেশে যে-কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই পারে। ক্ষমতাসীন সরকার দিল্লির মিত্র। হয়তো সরকারের কাছে অনুমতি নিয়েই তারা তা করছে। শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে কিছু ঘটলে ভারত যে চুপ করে থাকবে না সেই দিকটাও তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন।

সেনাবাহিনীতে 'বিশৃংখলা' বা 'অভ্যুত্থান' ঘটাবার কোন প্রয়াস থাকুক বা না থাকুক, বিগত সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পর থেকে বাংলাদেশের প্রতি ভারতীয় নীতি আগাগোডা ভারতের প্রতিরক্ষা ও সামরিক নীতির অধীনস্থ। দুই দেশের মধ্যে ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করা, বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারতকে করিডোর দেওয়া, বিডিআরকে 'বর্ডার গার্ড' অর্থাৎ সীমান্তের দারোয়ানে পরিণত করা ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যেই আমরা সেই নীতিরই বাস্তবায়ন দেখি। এই অভ্যুত্থানের প্রয়াসকে দিল্লি একটি বিশাল সুযোগ হিশাবে গ্রহণ করবে। কুলদীপ অবশ্য সেটা খোলামেলাই বলেছেন, 'এবারকার ব্যর্থ অভ্যুত্থান শুধু একটি সতর্ক বার্তাই নয়, একই সাথে দিল্লি সরকারের জন্য ছিল একটি সুযোগও'। তিনি ঠিকই ধরেছেন এবং ঠিকই বলেছেন। তাঁর সঙ্গে আমরা এক শ' ভাগ একমত হতে পারি। অবসর ও বদলির মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনীর মধ্যে যে অদলবদল চলছে, সেই রূপান্তরের প্রক্রিয়া এখন ত্বরান্বিত হবে। সেনাপতি মইন ইউ আহমেদের সময় থেকে ভারতের সামরিক ও প্রতিরক্ষানীতির বাইরে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর স্বাধীন কোন অস্তিত্ব আশা করা কঠিন হয়ে উঠেছিল। এখন তা আরো কঠিন হয়ে উঠবে। যেটা আমাদের বুঝতে হবে, কারো কারো জন্য যতই বেদনাদায়ক হোক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটা সংস্কার বা পুনর্গঠন চলছে। সেই ক্ষেত্রে কেউ 'বিশৃংখলা' বা 'অভ্যুত্থান' সৃষ্টির ব্যর্থ প্রয়াসে অংশগ্রহণ করে সেই পুনর্গঠনের ফাঁদে পা দিচ্ছে, আর কেউ সেই প্রয়াস দমন করে পুনর্গঠনকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলছে।

গত বছর নভেম্বরের ২৬ তারিখে কুলদীপ নায়ার গালফ নিউজেই আরেকটি লেখা লিখেছিলেন। শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা কমে যাচ্ছে, এই বাস্তবতা টের পাবার জন্য তাঁকে জেগে ওঠার পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি (ঐধংরহধ যধং ঃড় ধিশব ঢ় ঃড় ঃযব ৎবধষরঃু)। তবে প্রধানমন্ত্রী তার পরামর্শে জেগে ওঠেন নি, এটা নিশ্চিত। এবারের লেখাতেও তিনি স্বীকার করেছেন যে শেখ হাসিনার প্রতি জনগণের মোহ কেটে গিয়েছে। কিন্তু দিল্লিকে পরামর্শ দিয়েছেন তারা যে বাংলাদেশের পাশেই থাকবে এটা যেন তাডাতাডি বাংলাদেশের জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। দিল্লির সঙ্গে বাংলাদেশের স্বার্থের বিরোধ কূটনৈতিক মীমাংসার বাইরে চলে গিয়েছে অনেক আগেই। দিল্লির সঙ্গে পানির বিবাদ মিটবার সম্ভাবনা নাই বললেই চলে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অসম বাণিজ্যের পার্থক্য বাডতেই থাকবে, কমবার কোন সম্ভাবনা নাই। সীমান্তে বিএসএফের হত্যা ও নির্যাতন কমবে না। বাংলাদেশে ভারতীয় বিনিয়োগ বাডবে এবং বাংলাদেশীদের বিনিয়োগের সুযোগ কমবে। ইত্যাদি নানা কারণে দিল্লির বিরোধিতার রাজনীতি বাডবে। হয়তো বাংলাদেশের প্রতি এটাই দিল্লির নীতি। যাতে দিল্লির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের ক্ষোভ আরো বাডে এবং তার পরিণতিতে দিল্লির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের প্রতিরোধও আরো প্রকাশ্য ও দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। আর তখন য়েকান প্রতিরোধকেই ধর্মান্ধদের চেষ্টা, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে ইসলামি মৌলবাদ ও ইসলামি সন্ত্রাসীদের হামলা হিশাবে অভিহিত করা দিল্লির পক্ষে সহজ হবে। ইসলামের নাম নিয়ে নতুন্তপুরাতন বড-ছোট অনেক দল তখন পাওয়া যাবে যারা জেনে বা না জেনে দিল্লির ফাঁদে পা দেবে। ভারতের নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশকে দাবিয়ে রাখা দিল্লির পক্ষে তখন অনেক সহজ হবে। সমাজের সর্বত্র ক্ষোভ-বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে। তার প্রকাশ কোথায় কিভাবে ঘটবে আমরা জানি না। সেই ক্ষোভের প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিপন্ন করবার আহাম্মকি বড ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনবে।

বলাবাহুল্য বাংলাদেশ একটি সংকটের মধ্য দিয়ে সময় পার করছে। এর পরিণতি কী দাঁড়ায় আমরা এখনো সুনির্দিষ্ট ভাবে কিছু বলতে পারছি না। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে প্রপাগান্ডায় বিশ্বাস না করা। আসলে কী ঘটছে সেই দিকে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রথম কাজ। এখন এই উপলব্ধিটুকু দরকার যে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষার কর্তব্য শুধু সেনাবাহিনীর নয়, প্রতিটি নাগরিকের। কিন্তু বিদ্যমান সংকট আমরা অচিরেই সমাধান করতে পারব না। কারণ এখনো রাষ্ট্রগঠন ও গণপ্রতিরক্ষার প্রশ্নকে আমরা জাতীয় প্রশ্ন হিশাবে তোলা ও তার মীমাংসার জন্য তৈরি হতে পারি নি। আমাদের রাজনীতির প্রধান ইস্যু এখনো তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকা-না-থাকা এবং তার অধীনে নির্বাচন হওয়া-না-হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। মহাজোটের পরিবর্তে চারদলীয় জোটকে ক্ষমতায় বসানোর মধ্যে কোন সমাধান নাই।